

নাটক : ভূমিকা

ক. নাটকের ধারণা ও সংজ্ঞা

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। নাটক শব্দটির মধ্যেই নাটক কী, তার ইঙ্গিত রয়েছে। নাটক, নাট্য, নট, নটী — এই শব্দগুলোর মূল শব্দ হলো 'নট'। নট মানে হচ্ছে নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Drama। Drama শব্দটি এসেছে গ্রিক Dracin শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো to do বা কোনো কিছু করা। নাটকের মধ্যেও আমরা মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নড়াচড়া, কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার উপস্থাপন দেখতে পাই। Online free dictionary-তে নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- A prose or verse composition, especially one telling a serious story, that is intended for representation by actors impersonating the characters and performing the dialogue and action.

সাহিত্যের প্রাচীন রূপটিকে কাব্য বলা হতো। কাব্য ছিল দুই প্রকার—শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। তখন সাহিত্য প্রধানত পাঠ করে শোনানো হতো। আর যে কাব্য অভিনয় করে দেখানো হতো, সেগুলো ছিল দৃশ্যকাব্য। এ জন্য সংস্কৃতে নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য। কিন্তু নাটককে শুধু দেখার বিষয় বললে পুরোটা বলা হয় না, এতে শোনারও বিষয় থাকে। নাটক মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখা এবং সংলাপ শোনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। এটি একটি মিশ্র শিল্পমাধ্যম। সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্'। 'নাটক পাঠ করা যেতে পারে; মঞ্চে, টিভি-রেডিও বা অন্য গণমাধ্যমে অভিনীত হতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম।

খ. নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মূলত পাঠের জন্য হলেও নাটক প্রধানত অভিনয়ের জন্য। তাই এর বিশেষ কিছু গঠনবৈশিষ্ট্য রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকলেও নাটকে সাধারণত চারটি উপাদান থাকে। সেগুলো হলো—১. কাহিনী ২. চরিত্র ৩. সংলাপ ও ৪. পরিবেশ। নাটকের পাত্রপাত্রী বা চরিত্রগুলোর সংলাপ অথবা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। কাহিনীটি হয়তো মানবজীবনের কোনো খণ্ডাংশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

প্রতিটি নাটকে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে। নাটকের কাহিনী বা ঘটনা মূলত নাটকের এই পাত্রপাত্রী বা চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে নাটকের কাহিনী প্রকাশিত হয়। আবার চরিত্রগুলো মুখর হয় সংলাপের ভেতর দিয়ে। বলা যায়, সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রগুলোকে ব্যক্ত করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সংলাপের মাধ্যমেই তৈরি হয় নাট্য পরিস্থিতি। উপন্যাস বা গল্পে লেখক বর্ণনার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা করতে পারেন। নাটকে সে সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন সংলাপ। তাই নাটকের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে সংলাপের ওপর।

নাটকের কাহিনী, চরিত্র বা সংলাপ সংযোজনার জন্য নাট্যকারকে তৈরি করতে হয় উপযুক্ত পরিবেশের। অর্থাৎ কোন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এ ঘটনাটি ঘটছে বা কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে চরিত্র এ আচরণ করছে বা সংলাপ বলছে, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়। মঞ্চনাটকে মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, শব্দযোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এ কাজটি মূলত করেন নাট্য নির্দেশক। নাট্যকার তাঁর নাটকেই এর নির্দেশনা রাখেন। তবে উত্তম নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো সংলাপের বা অভিনয়ের ভেতর দিয়েই নাটকে পরিবেশ সৃষ্টি করা। নাটকের এই উপাদানগুলোকে একত্র করলেই সফল নাটক সৃষ্টি হয় না; নাটকে বিভিন্ন প্রকার ঐক্য রক্ষা করতে হয়। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল নাটকে তিন প্রকার ঐক্যের কথা বলেছেন। ঐক্যগুলো হলো—

১. কালের ঐক্য (Unity of Time)
২. স্থানের ঐক্য (Unity of Place)
৩. ঘটনার ঐক্য (Unity of Event)

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি নাটকটি মঞ্চে যতক্ষণ ধরে অভিনীত হবে, ততটুকু সময়ের মধ্যে যা ঘটনা সম্ভব নাটকে শুধু তাই ঘটানো হবে। এর বেশি কিছু ঘটানো হলে নাটকটির শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হবে। নাটকটি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। এ বিষয়ে একদল নাট্য-সমালোচক মনে করেন, এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মঞ্চে যতটুকু কাহিনি ঘটানো সম্ভব, তাই নাটকে থাকা উচিত। স্থানের ঐক্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকে চরিত্রগুলো যে পিঁ মাণ স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ভতটুকুই দেখানো। তার চেয়ে কমবেশি হলে নাট্যগুণ বিঘ্নিত হবে। নাটকে কাহিনির শুরু, বিকাশ ও পরিণতি থাকে। অর্থাৎ নাটকের কাহিনিটি আদি-মধ্য-অন্তসমষ্টিত থাকে। ঘটনার ঐক্য হলো এর সূচনা বিকাশ ও পরিণতির মধ্যে সমতা বা সামঞ্জস্য রাখা। মূল ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন ঘটনার সমাবেশ ঘটালে নাটকটির কাহিনির সামঞ্জস্যতা বিঘ্নিত হয়। তাই নাটকে অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটানো যাবে না। যা কিছু ঘটানো হবে, তা একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে। নাটকে একটি কাহিনি যেভাবে অগ্রসর হয়, তাকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। পর্বগুলো হলো—

১. কাহিনির আরম্ভ বা মুখ (Exposition)
২. কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি বা প্রতিমুখ (Rising Action)
৩. কাহিনির উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দৃশ্য বা গর্ভ (Climax)
৪. প্রতিক্ষোভ বা বিমর্ষ (Falling Action)
৫. যবনিকাপাত বা উপসংহতি (Conclusion)

অর্থাৎ একটি নাটক শুরু হওয়ার পর তার কাহিনির বিকাশ ঘটবে, এরপর বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কাহিনিটি চূড়ান্ত দৃশ্যমুহূর্ত সৃষ্টি হবে। তারপর কোনো সত্য বা তথ্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নাটকটির চূড়ান্ত দৃশ্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে এবং সবশেষে একটি পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এসব বৈশিষ্ট্য নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। সব নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। যেমন, সাম্প্রতিক অনেক নিরীক্ষাধর্মী বা অ্যাবসার্ড নাটকে নাটকের বর্ণিত এ উপাদানগুলো না-ও থাকতে পারে। সামুয়েল বেকেট রচিত 'ওয়েটিং ফর গডো'কে এভাবে পাঁচ পর্বে বিভক্ত করা যায় না। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার বা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থিয়েটারের ক্ষেত্রে নাটকের এ শর্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখানে মূলত প্রথাগত বা আদর্শ নাটকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে নাটক অভিনীত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায়ও দেখা গেছে, চর্যাপদ নৃত্য ও অভিনয়সহ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিবেশিত হতো। এ থেকে বলা যায়, বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজার বছরের। আমাদের স্বাধীনতার ঐতিহ্যও বেশ পুরনো। তবে নাটক অর্থে আমরা আধুনিক যে মঞ্চ নাটকের (Proscenium theatre) সাথে পরিচিত তা বাংলা অঞ্চলে এসেছে ইউরোপ থেকে। অবশ্য কলকাতায় প্রথম মঞ্চনাটকের যিনি আয়োজন করেন, তিনি ছিলেন একজন রাশিয়ান নাগরিক। তাঁর নাম হেরাসিম স্পেপানভিচ লেবেদেফ। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর তিনি ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে 'কাল্পনিক সংবাদ' নামে মঞ্চায়িত করেন। নাটকটি তাঁকে অনুবাদে সাহায্য করেন গোলকনাথ দাস। একইভাবে তিনি 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডব্লিউ' মঞ্চায়ন করেন। লেবেদেফ এ অঞ্চল থেকে চলে গেলে মঞ্চনাটকে ছেদ পড়ে। তার বেশ কয়েক বছর পর ১৮৫২ সালে অভিনীত হয় তারারচণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২)। তার পরের দুবছরে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) ও রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) মঞ্চায়িত হয়।

প্রথম বাংলা আধুনিক নাটক রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণ করে ১৮৫৯ সালে 'শমিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। তারপর একে একে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ' (১৮৬০) প্রভৃতি নাটক ও গ্রন্থন।

তার সমসাময়িক আরেকজন নাট্যকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে- 'নীল দর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ইত্যাদি।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটক ও প্রহসনের মধ্যে রয়েছে- 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'বসন্ত কুমারী' (১৮৭৩), 'এর উপায় কি?' (১৮৭৬) ইত্যাদি। এ সময়ের অন্যান্য নাট্যকারের নাটক ও প্রহসনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯০৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) 'সাজাহান' (১৯০৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪-১৯২৭) 'শ্রুতপাদিত্য' (১৯০৩) ইত্যাদি।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিচিত্র ধারার নাটক রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লিখিত বিখ্যাত নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'চিৎরাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'বাঙ্গালীকি প্রতিভা' (১৮৮১) প্রভৃতি।

রবীন্দ্র-পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে- শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৩৮), বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪), তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' (১৯৫১), উৎপল দত্তের 'কল্লোল' (১৯৬৮), বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫) প্রভৃতি।

ঘ. বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল মূলত কলকাতা। ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ঢাকাকে কেন্দ্র করে নাট্যচর্চা গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চায় স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের সমাজবাস্তবতা চিত্রিত হতে থাকে, যাতে বাঙালি মুসলমানদের সমাজচিত্রই বেশি। এ ধারার নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯) ও আসকার ইবনে শাইখ। নুরুল মোমেন রচিত নাটকের মধ্যে রয়েছে- 'নয়া খান্দান', 'নেমেসিস', 'এমন যদি হতো', 'রূপান্তর' প্রভৃতি। আসকার ইবনে শাইখের নাটকের মধ্যে রয়েছে- 'তিতুমীর', 'অগ্নিগিরি', 'রক্তপঙ্ক', 'বিত্রোহী পদ্মা', 'এপার ওপার' প্রভৃতি।

বাংলাদেশের আধুনিক ধারার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) অগ্রণী নাট্যকার। মুনীর চৌধুরী রচিত নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে- 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২), 'কবর' (১৯৬৬), 'চিঠি' (১৯৬৬) ইত্যাদি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা রয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে- সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৫), 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৬); শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮) রচিত 'আমলার মামলা', 'কাকর মনি'; আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) রচিত 'ইহুদির মেয়ে', 'মায়াবী গ্রহর'; আনিস চৌধুরী (১৯২৯ - ১৯৯০) রচিত 'মানচিত্র', 'এ্যালবাম'; সাঈদ আহমদ (১৯৩১ - ২০১০) রচিত 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট', 'তৃষ্ণায়', 'শেষ নবাব'; মমতাজ উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯) রচিত 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', 'হরিণ চিতা চিল', 'রাজা অনুধারের পালা', 'এই সেই কণ্ঠস্বর', 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'; আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮) রচিত 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'চারদিকে যুদ্ধ', 'সেনাপতি', 'অরক্ষিত মতিঝিল'; সেলিম আল দীন রচিত (১৯৪৮-২০০৮) রচিত 'জগতি ও বিবিধ বেলুন', 'সর্প বিষয়ক গল্প', 'কিঙনখোলা', 'প্রাচ্য', 'নিমজ্জন'; সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) রচিত 'নুরুলদীনের সারা জীবন', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'গণনাযক'; মামুনুর রশীদ (জন্ম. ১৯৪৮) রচিত 'ওরা কদম আলি', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'এখানে নোঙর' ইত্যাদি।

৬. বহিপীর নাটক ও নাট্যকার পরিচিতি: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমাদউল্লাহ ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। মাতা নাসিম আরা খাতুন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মাত্র আট বছর

বয়েসে মাতৃহারা হন। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল ডিস্টিঙ্কশনসহ বিএ। তাঁর পেশাজীবন শুরু হয় 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার মধ্য দিয়ে। মাঝখানে কিছুদিন বেতারেও চাকরি করেন। তারপর বিদেশে তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করেন। ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্যারিসে সর্বশেষ কাজ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ চলাকালে তিনি প্যারিসে থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৯), নাটক 'বহির্পীর' (১৯৬০), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫), নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৫), উপন্যাস 'কাদো নদী কাদো' (১৯৬৮)। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি 'পিইএন পুরস্কার' (১৯৫৫), 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' (১৯৬১), 'আদমজী পুরস্কার' (১৯৬৫) ও 'একুশে পদক' (মরণোত্তর, ১৯৮৪) লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

বহির্পীর

'বহির্পীর' নাটকটি ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় 'পিইএন ক্লাবের' উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সেখানে বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতায় 'বহির্পীর' নাটকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে।

'বহির্পীর' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে এক পিরকে কেন্দ্র করে। এই পির সারা বছর বিভিন্ন জেলায় তাঁর অনুসারীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। এক এক এলাকায় এক এক ধরনের ভাষা। তাই তিনি বিভিন্ন এলাকার ভাষা শিক্ষা না করে বইয়ের ভাষায়ই কথা বলে থাকেন। এ জন্য তাঁর নাম হয়েছে 'বহির্পীর'। নাটকের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম অনুসারেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'বহির্পীর'। নামটির একটি প্রতীকী তাৎপর্যও রয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজে পির সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে। মূলত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই পির সমাজের সৃষ্টি। এ হিসেবে তাঁরা ধর্মীয় ব্যাখ্যা মাসায়েল বইয়ের পাতা থেকেই মানুষের সংস্কারকে পুঁজি করে সমাজে ছড়িয়ে পড়েন। নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পিতা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। পিতার বদলির চাকরি সূত্রে ওয়ালীউল্লাহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান। তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজে তখন জেঁকে বসা পির প্রথা কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান। ফলে তিনি 'লালসালু' উপন্যাসে যেমন, তেমনি এই নাটকেও সে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

নাটকটি গড়ে উঠেছে বহির্পিরের সর্বহাসী স্বার্থ ও নতুন দিনের প্রতীক এক বালিকার বিদ্রোহের কাহিনিকে কেন্দ্র করে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহির্পির। তিনি দুই বছরান্তে একবার শিষ্য বা মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। তখন মুরিদরা সর্ব্ব দিয়ে তাঁর সেবা করেন। এবার এক মুরিদ তাঁর মাতৃহারা কন্যা তাহেরাকে এই বৃদ্ধ পিরের সাথে জোর করে বিয়ে দেন। তাহেরা তা মেনে না নিয়ে পালিয়ে যায়। সে পালিয়ে হাতেম আলি জমিদারের শহরগামী বজরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বহির্পির তাঁর সঙ্গী হকিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে তার সন্ধানে বের হন। পথিমধ্যে বহির্পিরের নৌকা দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনি ঘটনাচক্রে হাতেম আলির বজরাতেই আশ্রয় লাভ করেন। একসময় তিনি জানতে পারেন, এই বজরাতেই তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী তাহেরাও আছে। তখন তিনি তাকে পাওয়ার জন্য নানারকম কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। অন্যদিকে বজরায় জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাহেরার করুণ কাহিনি জেনে তার পক্ষ নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বজরার মধ্যে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। বহির্পির জঘন্য কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। এমনকি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগও গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহির্পির জয়ী হতে পারেন না। তাহেরা ও হাশেম আলি সব বাধার জাল ছিন্ন করে পালিয়ে যায়। বহির্পির অবশেষে বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

চ. নাটকের চরিত্র পরিচিতি: বহির্পীর

বহির্পীর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নাম চরিত্র। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। তিনি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তাঁর ধর্মব্যবসায় পরিচালনা করেন। তিনি সারা বছর তাঁর মুরিদদের বাড়ি

বাড়ি ঘুরে বেড়ান। তাদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ সংগ্রহ করেন। এবার তিনি বৃদ্ধ বয়েসে এক মুরিদের কন্যাকে বিয়ে করে বসেন। মুরিদ ও কন্যার সৎমাতা মিলেই সব আয়োজন করে। কিন্তু কন্যা পালিয়ে যায়। তখন তিনি নিজেই জীবন সন্ধানে বের হন এবং ঘটনাচক্রে তার সন্ধানও পেয়ে যান। তখন তিনি অত্যন্ত চালাকি ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাটকে আমরা তাঁকে এ পর্যায়েই দেখতে পাই। আমরা দেখি, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান লোক। বাস্তব বুদ্ধিও তাঁর টনটনে। তাঁর জীবকে উদ্ধারে তিনি পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করার অভিনয় করেন। কিন্তু জানে, এতে অনেক ঝামেলা। তাই ওই পথে এগোন না। তিনি প্রথমে ধর্মীয় বিয়ের দোহাই দেন। কিন্তু তাহেরা তার পাঁচটা যুক্তি দিলে তা থেকে তিনি সরে আসেন। তিনি তখন মানবিকতার বাহানা করেন। বলেন এ মেয়ে কখনো স্নেহ-মমতা পায়নি। তাঁর কাছ থেকে স্নেহ-মমতা পেলে বুঝতে পারবেন। এতেও কাজ না হওয়ায় তিনি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি টাকা দিয়ে জমিদারের জমিদারি রক্ষা করার প্রস্তাব করেন। শর্ত হিসেবে তাহেরাকে ফেরত চান। কিন্তু তাঁর সব চক্রান্ত একসময় ব্যর্থ হয়। তাহেরা ও হাশেম আলি পালিয়ে যায়। তখন আমরা দেখি তিনি বাস্তবতা মেনে নেন। তিনি তাদের তাড়া করতে নিষেধ করেন। এতে তাঁর একই সাথে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তবজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহেরা

তাহেরা এই নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং একবিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কেননা, তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাবলি আবর্তিত হয়েছে। সে মাতৃহারা। তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমাতা তাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সে এ অন্যায্য বিয়ে মেনে না নিয়ে পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরগামী বজরায় চড়ে বসেছে। কিন্তু একসময় পিরের কাছে ধরা পড়ে। বজরার একমাত্র হাশেম আলি ছাড়া অন্য সবাই প্রায় তার বিরুদ্ধে গেলেও সে বৃদ্ধের সাথে তার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এ হিসেবে তাহেরা একটি অত্যন্ত অনমনীয় চরিত্র। কিন্তু যখন সে জমিদারের অসহায়ত্বের কথা জেনেছে, তখনই সে রাজি হয়েছে। মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থাৎ সে একই সাথে অনমনীয় ও মানবিক চরিত্র। সবশেষে সে নতুন জীবনের সন্ধানে হাশেম আলির হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা যায়।

হাশেম আলি

হাশেম আলি জমিদারপুত্র। সে এই নাটকে কাহিনির দৃশ্যপট পরিবর্তনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে কেন্দ্রীয় চরিত্র বহির্পিরের বিপরীত চরিত্র। সে অত্যন্ত শান্তভাবে বহির্পিরের কূটচালকে মোকাবিলা করেছে এবং পরিশেষে জয়লাভ করেছে। বহির্পির নেতিবাচক চরিত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসেবে সে জীবন ও জগৎকে গণনা করে। অন্যদিকে হাশেম আলি ইতিবাচক চরিত্র। মানবীয় মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের গুরুত্ব তার কাছে সর্বাধিক। এ অর্থে হাশেম আলিকেই নায়ক এবং বহির্পিরকে খলনায়ক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। হাশেম আলি জমিদারপুত্র হলেও বৈষয়িক বিবেচনা তার কাছে কম। জমিদারি নিয়ে ভাবে না। সে বিএ পাস। এখন একটি প্রেস বসাতে চায়। পিতার জমিদারি চলে গেলে এবং এজন্য প্রেস বসাতে না পারলেও সে চিন্তিত নয়। সে ভাবে, যখন পড়ালেখা করেছে তখন একটা কিছু হয়ে যাবে। সে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। বজরায় সেই প্রথম অচেনা মেয়েটির সমস্যার প্রকৃতি উপলব্ধি করে। সে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। মেয়েটি আত্মহনন করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করে। পুরো বজরার মানুষ যখন তার বিরুদ্ধে তখনো সে মেয়েটির পক্ষ ত্যাগ করেনি। নাটকে তাকে অস্থিরচিও বলে বর্ণনা করা হলেও সে তার অবস্থানে ছিল স্থির। এ ক্ষেত্রে মাতার সাবধানবাণী, বহির্পিরের ভীতি প্রদর্শন, পিতার করুণ মুখ কিছুই তাকে পিছু হটাতে পারেনি। সে তাহেরাকে বাঁচাতে চেয়েছে। এমনকি বিয়ে করে হলেও। জমিদারপুত্র হিসেবে তাহেরা তার কাছে অচেনা একটি পরিচয়হীন মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব বৈষয়িক বিষয়বস্তু ত্যাগ করে মেয়েটিকে নিয়ে অনিশ্চিত-অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তার এ পদক্ষেপকে অবশেষে বহির্পির নিজেই সঠিক বলে অনুমোদন করেছেন। হাশেম আলি ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র।

হাতেম আলি

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে তাঁর জমিদারি 'সূর্যাস্ত আইনে' নিলামে ওঠে। জমিদারি রক্ষার জন্য তিনি শহরের বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তাঁর জমিদারি নিলামের সংবাদটি তিনি পরিবারের সবার কাছে গোপন রেখেছেন। চিকিৎসার অজুহাত দিয়ে তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য শহরে গিয়েছেন, কিন্তু তিনি অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি বহির্পীরের কাছে কথাটি বলেন। বহির্পীর তাঁকে কঠিন শর্ত দেয়। অর্থ ধারের বিনিময়ে তাঁর ক্রীকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। মেয়েটিও এতে রাজি হয়। কিন্তু বেকে বসেন জমিদার নিজেই। কেননা তাঁর নিজেকে নিজের কাছে কসাই মনে হতে থাকে। তাঁর মানবিক মূল্যবোধ জাহত হয়। তিনি টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে হাতেম আলির উচ্চ নৈতিকতাবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। হাতেম আলি স্থিতবী, আত্মনিমগ্ন উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পন্ন একটি উজ্জ্বল চরিত্র।

অপ্রধান চরিত্রসমূহ

হকিকুল্লাহ ও জমিদার গিনি এই নাটকের দুটি অপ্রধান চরিত্র। জমিদার গিনি অত্যন্ত সাদামাটা একটি চরিত্র। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিন্তু অত্যন্ত ধর্মভীরু। বজরায় একটি অচেনা মেয়ে আশ্রয় চাইলে তিনি তাকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। মেয়েটির দুঃখের কাহিনি জেনে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। আবার যখন জেনেছেন, মেয়েটি একজন পিরের পালিয়ে আসা স্ত্রী তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, এ বিয়ে অন্যায়, কিন্তু পিরের অভিশাপের ভয়ে ভীত থেকেছেন। আবার ছেলে ও পির মুখোমুখি অবস্থান নিলে তিনি পিরের পক্ষ নিয়ে নির্বাক থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ছেলেকেও শক্তভাবে দমন করতে পারেননি। তাঁর মধ্যে বাঙালি চিরায়ত মায়ের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠেছে। হকিকুল্লাহ পিরের ধামাধরা একটি ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে বহির্পীরের সহকারী। নাটকে সে মূলত পিরের আজ্ঞা পালন করেই চলেছে।

নাটকটিতে প্রতিকলিত সমাজচিত্র থেকে বোঝা যায়, নাটকটির সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। নাটকে দেখা যায়, জমিদার হাতেম আলি 'সূর্যাস্ত আইনে' তাঁর জমিদারি হারাতে বসেছেন। 'সূর্যাস্ত আইন' প্রণীত হয় ১৭৯৩ সালে এবং এ আইনে জমিদারি হারাতে থাকে এ সময় পর্যন্ত। সে সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেকে বসা পির প্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে এই নাটকে। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই পির সাহেবকে ধনিগরিব সবাই অসম্ভব ভয় ও মান্য করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের পিরকে পেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার সেবা করার জন্য পাগল হয়ে যায়। ধনসম্পদ থেকে শুরু করে নিজ কন্যাকে পর্যন্ত তারা দান করে। নাটকটি বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত পির প্রথার একটি বিশ্বস্ত দলিল। কিন্তু নাটকটি শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোর পথ দেখায়। এ অবস্থা বদলানোর সংকেত প্রদান করে। নাটকটির দুটি প্রধান চরিত্র হাশেম আলি ও তাহেরা এ ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের স্থানে মানবিকতার জয় হয়। অপরাপর চরিত্রগুলোর মধ্যেও যৌক্তিক মানবিক বোধ জাহত আছে বোঝা যায়। নাটকটি এভাবে মানবিক জাগরণের দৃশ্যকাব্য হয়ে ওঠেছে।